গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

গৌড়বঙ্গের ইতিহাস

গৌড়বঙ্গের ইতিহাস

"কবির চিত্ত-ফুলবণ-মধু লয়ে,
রচ মধুচক্র, গৌড় জন চাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

কবি শ্রী মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সূচনা করেছেন এইভাবে গৌড়জনের উল্লেখ দিয়ে। এখানে গৌড়জন বলতে তিনি বাঙ্গালা মাত্রই বুঝিয়েছেন। আবার শ্রী চৈতন্যদেব গৌড়ের নিকট রামকেলিতে এসেছিলেন। এই গৌড় বাংলার মধ্যযুগের রাজধানী ছিল। বর্তমানে তা মালদা শহরের থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে।

লক্ষণ সেনের রাজধানী ও ছিল গৌড়-লক্ষ্মাবতী। গৌড় নামে যেমন নগরী বা রাজধানী ছিল তেমনি 'গৌড়জনপদ' নামেও এক জাতির কথা ইতিহাসে জানা যায়। বিশেষত তাদের বীরত্বে কথা দেশ বিদেশে রূপ কথার জন্ম দিয়েছে। যেমন- কাশ্মীর পন্ডিত কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'র কথা বলা যায়। এছাড়া বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং হিউএনসাঙের বিবরণ থেকে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কথা জানা যায়।

এছাড়া স্কন্ধপুরাণ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে পঞ্চগৌড়ের কথাও জানা যায়— সারস্বত, কন্যাকুজ, উৎকল, মিথিলা এবং গৌড় রাজনৈতিক প্রতাপের বাইরে সংস্কৃতি চর্চায়ও বহিঃবিশ্বে নিজস্ব স্বকীয়তা দেখিয়েছিলেন। দন্ডীর 'কাব্যাদর্শ' ও রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' গৌড়ীয় প্রকৃত ভাষার এক বিশেষ রূপ।

পাল-সেনামলের পরবর্তী কালে অর্থাৎ মুসলমান শাসনামলেও গৌড়ের প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করে। এই সময়েই মূলত 'গৌড়বঙ্গ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, গৌড় এবং বঙ্গ দুটি আলাদা জনপদ একত্রিত হবার ফলে গৌড়বঙ্গ নামকরন হয়। অনেকে আবার মনে করেন গৌড় জনপদের দ্বারা বঙ্গ জনপদ বিজিত হয় অথবা বঙ্গ জনপদের দ্বারা গৌড় জনপদ অধিকৃত হবার ফলে গৌড় এবং বঙ্গ একই সম্রাটের শাসনাধীন হবার ফলে গৌড়বঙ্গ একসঙ্গে উল্লেখিত হয়।

গৌড় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতায় বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সামন্ত রাজ্য গুলি নিজের স্বাধীনতা লাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। যার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সুযোগে শশাঙ্ক 'গৌড়াধিপ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন গৌড়রাষ্ট্রের সূচনা করেন আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। কর্ণসুবর্ণে তার রাজধানী স্থাপন করে তিনি শাসন ব্যবস্থা চালাতে থাকেন এবং বাংলা ও বিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন।

শশাঙ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কে উপাদান সংগ্রহ করা যায় ব্লোতাসগড় দূর্গপ্রাকারে উৎকীর্ণ "মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবর" সিলমোহরের ছাঁচ থেকে। এ থেকে মনে হয় তিনি প্রথম জীবনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। এছাড়া শশাঙ্কদেবর অধীনস্ত সামন্ত শুভকীর্তি এবং সোমদত্ত উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় মেদিনীপুর তাম্রশাসনে একথা সমর্থন করে। সামন্ত দ্বিতীয় মাধববর্মার গঞ্জাম তাম্রশাসনটি থেকে জানা যায় শশাঙ্ক উড়িষ্যাতেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। শশাঙ্কদেবের রাজত্বকাল ৬০০-৬২৫খ্রীঃ পর্যন্ত। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার এ সম্পর্কে বলেন—

"বাংলার ইতিহাসের দু-জনমাত্র নরপতি সর্বভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ সসম্মানের পাত্র হয়েছিলেন। তাঁদের একজন শশাঙ্ক এবং দ্বিতীয় জন ধর্মপাল।"[১]

শশাঙ্কর গৌড়

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বছর গৌড়রাষ্ট্রে কোন দীর্ঘ স্থায়ী রাজা ছিলেন না। কেউ এক বছর তো কেউ কয়েক মাস। এই সময় যশোবর্মন কতৃক কিছুদিন গৌড় অধিকৃত থাকে। যদিও সে বিজয় বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। কারণ কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কতৃক ততদিনে তিনি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্য হারান। কলহণের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে এতথ্য জানা যায়। কিছুকাল পরে কামরূপের ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্ষদেব গৌড়ের প্রভুত্ব অধিকার করে বলে জানা যায়।

এরপর ললিতাদিত্যর পৌত্র জয়াপীড় পুন্ডবর্ধণরাজ জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করে তার সৈন্যবাহিনী দ্বারা গৌড় অধিকার করেন এবং পঞ্চগৌড়ের অধিপতি করেন। তখন থেকে গৌড়ের ঐক্য পুনরায় সূচিত হয়।

পালযুগ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর গৌড়বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগন অন্ধকারময় যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকে আবার 'মাৎস্যণ্যায়' বলেও বর্ণনা করেন এই সময়টিকে। আনুমানিক আবার ৭৫০খ্রীঃ এই মাৎস্যণ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে বাংলার মসনদে বসেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। যদিও এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল বাংলার অনৈক্যর ফলে প্রতিবেশী রাজাদের বার বার আক্রমনে অতিষ্ট হয়ে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হন গোপাল।
গোপালের পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু, তিনি 'সর্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ' ছিলেন। এনার আদিনিবাস বরেন্দ্রভূমি।

এই সর্ববিদ্যা বিশারদের পুত্র 'বপ্যট' ছিলেন যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ। দীনেশচন্দ্র সেন এই সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন— "সেই ঘোর অরাজকতা পূর্ণ চৌরদস্যু অধ্যুষিত বঙ্গদেশে তখন পন্ডিতদের পুত্র কেও শাস্ত্র ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিতে হইয়াছিল।"[২]

এই 'বপ্যট'-র ছেলে গোপাল দ্বারা গৌড়রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং তার যোগ্যপুত্র ধর্মপাল তার রাজ্যের পরিধিকে আরও দ্রুত বাড়াতে সক্ষম হন। দীনেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রনিধান যোগ্য— "গোপাল ছিল পূর্ণ চন্দ্র— গৌড়মন্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন— তাঁহার উদযাপ্ত মহিমান্বিত, উজ্জ্বল অথচ শান্ত। কিন্তু তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ছিলেন মধ্যাহ্ন মার্ত্তন্ড তেজ, বিক্রম ও উচ্চাকাঙ্খার প্রতীক। তিনি গৌড় মন্ডলে একছত্র রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। তাহার সিংহাসন ছিল বজ্রতুল্য দৃঢ়— তাহার বিজয়লক্ষ্মী ছিলেন বজ্রাসনে স্থিত, অবিচলিত।"[৩]

৭৫০ থেকে ৭৭০ পর্যন্ত খ্রীঃ পর্যন্ত গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং তার পুত্র ধর্ম্মপাল প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব পরিচালন করেন। অর্থাৎ ৭৭০ খ্রী থেকে ৮১০খ্রীঃ পর্যন্ত। এইসময়ে তিনি গঙ্গার সকল অববাহিকায় তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয়, কনৌজকে কেন্দ্র করে গোটা উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্যকে কায়েম করে। খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়— ভোজ, মৎস, বদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা

আমাদের গবেষণার ভৌগলিক পরিসীমা (মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর)

কনৌজের দরবারে এসে ধর্মপালের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মপাল যে নতুন গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। সামরিক বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তার রাজধানী পাটলিপুত্র হলেও সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডের কেন্দ্র কিন্তু ছিল গৌড়। মূলত ধর্মপালের সাম্রাজ্য ছিল বঙ্গ ও বিহারকে নিয়ে। এছাড়া কণ্যকুব্জ ছিল সামন্ত রাজ্য এবং বাকি সব কদর রাজ্য। তাই আমাদের বলতে অসুবিধা নেই যে তার সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত বঙ্গ ও বিহার নিয়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর গৌড় সাম্রাজ্য।

ধর্মপালের পরবর্তী পাল রাজা হলেন দেবপাল ৮১০-৮৫০খ্রীঃ। মতান্তরে ৮০০-৮৪৮ খ্রীঃ উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি গৌড়বঙ্গ বিহারের অধিপতি হন। তাঁর রাজধানী সম্ভবত মগধে ছিল বলে অনুমান করা হয় তার লেখমালা থেকে। ঐতিহাসিক রূপশী চট্টোপাধ্যায় মনে করেন— "দেবপালের রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর এবং রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত।"[৪]

এই দেবপাল ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং বীর। বিভিন্ন লেখকের তথ্য থেকে জানা যায়, তাঁর চিত্ত ছিল নির্মল এবং সংযত বাক্ ও সংযত ব্যবহারের সাথে চরিত্র শুদ্ধি সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। পিতার অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করেন এবং দ্রাবিড়াধিপতি ও পিতৃশত্রু গুর্জ্জর নাথকে তিনি পরাস্ত করেন। রাষ্ট্র কূটাধিপতি অমোঘবর্ষকে তিনি পরাজিত করেন। কম্বোজগন গৌড় আক্রমন করলে দেবপাল কতৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হন। এছাড়া তিনি গুর্জ্জর, হুণ এবং প্রাগজ্যোতিষপুর অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফলে সহজেই অনুমান করা যায় যে দেবপাল সমগ্র ভারতের অদিপতি না থাকলেও যে বৃহত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন তৎকালে এবং গৌড় রাষ্ট্রের খ্যাতি চারিদিকে প্রসারিত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

দেবপালের পরবর্তীকালে গৌড়রাষ্ট্রে সাময়িক বিশৃংখলা দেখা দিলেও প্রথম মহীপাল সিংহাসন লাভের পর (৯৭৭-১০২৭) পুনরায় রাষ্ট্রিয় ঐক্য দেখা দেয়। বানগড় তাম্রলিপি থেকে জানা যায় মহীপাল কম্বোজদের বিতাড়িত করে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর রাজত্ব কিছুটা সীমিত হলেও, উত্তর রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, অঙ্গ, বানারসী ও মগধ তার সাম্রাজ্য ভূক্ত ছিল। তবে

পূর্বসসূরীদের মত বাংলার বাইরে নয়, তিনি এবার রাজধানী স্থাপন করেন গৌড়কে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক শক্তির প্রাণ কেন্দ্র ছিল রাঢ় ও বরেন্দ্রী। তিনি নিজে 'গৌড়াধিপ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

মহীপালের পরে কেন্দ্র শক্তির দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক সামন্ত রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সম্ভবত এই সময় গৌড় রাষ্ট্রের সীমানা পুন্ড্রবর্ধনের মধ্যে সীমাবদ্দ হয়ে পড়ে। এই সময়ে রামপাল (১০৭৭-১১২০খ্রী) গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গম স্থলে, রামাবতী নগরী স্থাপন করেন। মদন পালের মনহলি তাম্রশাসন থেকে জানাযায়, রামাবতী পালদের পতন পর্যন্ত রাজধানী ছিল। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে' রামাবতীর কথা উল্লেখ আছে।

১১২০-১১৫৫ খ্রীঃ নাগাদ পালদের পতন শুরু হয় বলে অনুমান করা হয়। এই সময় কামরূপের সামন্ত রাজারা এবং বাংলার বর্মন রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শেষ রাজা মদন পাল বিজয় সেন কতৃক পরাজিত হলে পাল সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং গৌড়মন্ডলে সেন বংশের রাজত্ব কায়েম হতে শুরু করে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, আমরা আমাদের আলোচনায় পাল বংশের প্রধান প্রধান নরপতিদের কথা উল্লেখ করেছি। অপেক্ষাকৃত গৌন এবং হীন সম্রাটদের কথা অযথা তুলে ধরে গ্রন্থের বিশালতার ইচ্ছে আমাদের একেবারে নেই।

পাল সম্রাটদের শিলালিপি ও তাম্রশাসনে যে সব পাল রাজাদের কথা উল্লেখ আছে তার সাথে কিছুটা অমিল থাকলেও লামা তারা নাথ পাল সম্রাটদের এক দীর্ঘ তালিকার উল্লেখ করেছেন। নিচে তালিকাটি দেওয়া হলো—

'১। গোপাল-৬৬০-৭০৫ খ্রীঃ

২। দেবপাল-৭০৫-৭৫৩ খ্রীঃ

৩। বসুপাল-৭৫৩-৭৬৫ খ্রীঃ

৪। ধর্ম্মপাল-৭৬৫-৮২৯ খ্রীঃ

৫। মধুরক্ষিত-৮২৯-৮৩৭খ্রীঃ

৬। বানপাল-৮৩৭-৮৪৭ খ্রীঃ

৭। মহীপাল-৮৩৭-৮৪৭ খ্রীঃ

৮। মহাপাল-৮৪৭-৮৯৯ খ্রীঃ

৯। সানুপাল-৯৪০-৯৫২ খ্রীঃ

১০। শেষ্ঠপাল-৯৫২-৯৫৫ খ্রীঃ

১১। শমক- ৯৫৫-৯৮৩ খ্রীঃ

১২। ভায়াপাল-৯৮৩-১০১৫ খ্রীঃ

১৩। ন্যায়পাল-১০১৫-১০৫০ খ্রীঃ

১৪। তাম্রপাল-১০৫০-১০৬৩ খ্রীঃ

১৫। হস্তিপাল-১০৬৩-১০৭৮ খ্রীঃ

১৬। শান্তিপাল-১০৭৮-১০৯২ খ্রীঃ

১৭। রামপাল- ১০৯২-১১৩৮ খ্রীঃ

১৮। যক্ষপাল-১১৩৮-১১৩৯ খ্রীঃ'[৫]

সেন আমল

সেনবংশের প্রথম রাজা সামন্ত সেন। ইনি সম্ভবত পালদের অধীনস্ত রাঢ়দেশের সামন্ত রাজা ছিলেন। বীর সেনের বংশজাত এই সামন্তসেন কর্ণাটকের রাজা ছিলেন। কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ এবং শত্রুদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে কর্ণাটক ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যথা—

"দুর্ব্বৃত্তা নামায় মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠকানং কদন মতনোত্তাদৃগেকাঙ্গ বীরঃ।
যস্মদদ্যাপ্যবিহিত বসামাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা।।"[৬]

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্তসেন প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। দেত্ত পাড়া প্রসস্তি থেকে জানাযায়, তিনি রাজাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন। অনেকে মনে করেন— "দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে হেমন্ত সেন সুরপাল ও রামপালকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মনে হয়, পাল রাজকুমার দ্বয় গৌড় থেকে পালিয়ে এসে রাঢ়াতে আশ্রয় নেন।"

হেমন্তসেনের রাজত্বকাল মুটামুটি ১০৪৫ খ্রীঃ -১০৭৯ খ্রীঃ। পালদের পতনের সাথে সাথে গৌড়ের রাজনৈতিক প্রভাব ও কমতে শুরু করে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। ফলে বৃহত্তর গৌড় পরিমন্ডলে রাজনৈতিক বাতাবরনের কোন দীর্ঘস্থায়ী শৃংখলের অভাব বোধ হয়েছিল। এই সময় বিজয়সেন (১০৭খ্রীঃ-১১১৯খ্রীঃ মতান্তরে ১০৯৫-১১৫৮) পুনরায় গৌড়ের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

বিজয় সেন থেকে রাজ্যের বিস্তার শুরু হয়। অনেক রাজা এই সময় সেনবংশের অধীনতা স্বীকার করেন। বল্লাল সেন কৃত 'দানসাগর' গ্রন্থে আছে—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখর বিণিহিতাজ্ঞাবৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রনতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশঃ।।"৮

বিজয়সেন পালদের ক্ষমতার মূলকেন্দ্র গৌড় জয় করেই সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন। দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে যতদূর জানা যায় তা থেকে মনে হয় মিথিলা, কলিঙ্গ, কৌলম্বী, কামরূপের এবং ওড়িষ্যা জয় করে যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার প্রান কেন্দ্র ছিল গৌড়ভূমি।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পরে তার সুযোগ্য পুত্র বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ১১১৯ খ্রীঃ-১১৬৯খ্রীঃ। ইনি সেন বংশের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। আবুল ফজলের মতে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছেন। এই সময় গৌড় রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল,— রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি ও মিথিলা। প্রত্যেকভাগে একজন করে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন।

বল্লাল সেনই বাংলায় সর্বপ্রথম কুলীণ প্রথা চালু করেন। এই কাজের জন্য বল্লাল সেনের নাম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। পিতা বিজয় সেন ছিলেন বৈদিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু বল্লাল সেন তান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তান্ত্রিক কুলাচারীদের কুলীনত্ব প্রদান করেন। আদিশুরের মত বল্লাল সেনও কনৌজ থেকে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মন নিয়ে আসেন ব্রাহ্মন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। এই সময়ে বাংলার সুবর্ণ বণিকে বা জল অনাচরণীয় হয় এবং উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হয়।

স্বর্ণবণিক এবং গন্ধ বণিকেরা এই সময় বাংলার প্রধান বণিক জাতি। বর্তমানের নমশুদ্ররা তাদের 'মতুয়া সাহিত্যে' দাবী করে তারাও এক কালে ব্রাহ্মণদের সমপর্যায়ে ছিলেন এবং উপবীত ধারণ করতেন। কিন্তু বল্লল সেনের অত্যাচারে তাঁদের নিম্ন শ্রেনীর আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ ও অত্ম গোপন করতে হয়।

যতদূর জানাযায়, নমঃশুদ্ররা হরিচাঁদ ঠাকুরে (বিশ্বাস) প্রবর্তীত মতুয়াধর্মের আশ্রয়ে সংঘবদ্ধ হয় এবং তৎপুত্র গুরুচাদ ঠাকুরের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯১১ সালের সেন্সাস.রিপোর্টে 'চন্ডাল'। চাঁড়াল থেকে 'নমঃশুদ্র' বলে পরিগণিত হয়। আক্ষরিক অর্থে চন্ডাল তাঁরা কোনদিনই ছিলেন না। কেবল মাত্র চন্দাইল বা চন্দ্রাইল কথার অভ্রাংশ হিসাবে মনুবাদীদের দ্বারা আরোপিত শব্দ এটি। ইতিহাস থেকে পাচ্ছি—

"সপ্তম চন্দেল-রাজ ধঙ্গদেব ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৯৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।"... এছাড়া গৌড়শ্বরের "রাজসৈন্যের মধ্যে চাঁড়াল ও বাগ্দী জাতীয় বিন্ডর লোক ছিল।"[৯]

এথেকে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে নমঃশুদ্ররা কোনো কালেই ব্রাহ্মণ ছিল না, বরং ক্ষত্রিয় ছিলেন। তার প্রমান এখনও যেসব নমঃশুদ্র পরিবারে প্রাচীনেরা আছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ঢাল, বর্শা, বল্লম, রামদা যত্ন সহকারে রক্ষিত আছে এবং সেগুলি পরিবারের গৌরব বহন করছে।

বিহারের চন্দাইল জেলা অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী নগরী প্রচুর ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমনের ফলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও বসবাস যোগ্য স্থান হিসাবে পৌন্ড্রবর্ধন কে নির্বাচন করে বসবাস করতে শুরু করে এরা। পরবর্তীকালে বৃহৎবঙ্গে তারা ছড়িয়ে পড়ে। মতুয়া সাহিত্যকার বিচরণ পাগল নমঃশুদ্রদের নিম্নজাতিতে পরিণত হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে—

"দেশ ছাড়ি কেহ কেহ করে পলায়ণ।
রাজার স্ববশে তবু নহে কোনজন।।
কেহ গিয়ে ধান্য ক্ষেতে রোপিতছে ধান্য।
ধানী নমঃশুদ্র বলে হ'ল সবে গণ্য।।"[১০]

যাই-ই হোক, আলংকারিক আনন্দ ভট্টের মতে বল্লাল সেন চল্লিশ বছর, দুই মাস, রাজত্ব করে সস্ত্রীক সর্গারোহণ করেন। অবশ্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় অবশ্য এই মত মেনে নিতে চাননি।

লক্ষ্মণ সেন

মহারাজ বল্লাল সেনের পরে তার যোগ্যপুত্র লক্ষণ সেন গৌড়ের সিংহাসনে বসেন (১১৬৯-১২০৬খ্রীঃ)। রাজকুমার লক্ষ্মণ সেনের জন্মাব্দ চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য বল্লাল সেন ১১১৯খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন সংবতের প্রচলন করেন। লক্ষ্মণাব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 'লসং'। এই লক্ষ্ম সেনের রাজত্ব কালেই গৌড়ের বিদ্যার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গৌড়ের রাজসভা তখন গুণিজনের ঘনঘটা অর্থাৎ নবরত্নের যৌলুস বিশ্বময় ব্যপ্ত।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় আমরা যে নবরত্নকে পাই তারা হলেন— হলায়ুধ, শূলপানি, নারায়ন দত্ত, জয়দেব, শরণ, গোর্বধনাচার্য্য, উমাপতি ধর, ধোয়ী এবং কালিদাস।

হলায়ুধ ছিলেন মহাপন্ডিত। তিনি শ্রুতি-স্মৃতি, পুরান ও তন্ত্রের সারসংগ্রহ করে "মৎস্যসুক্ত" রচনা করেন। এই সময় গৌড়বঙ্গ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় সমাচ্ছন্ন ছিল এর ফলে হিন্দুসমাজের সদাচার রক্ষা হয় আবার তান্ত্রিকতার প্রতিকূল না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য এই 'মৎস্যসুক্ত' রচনা করেন। এছাড়া 'মীমাংসা-সর্ব্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব', 'শৈবসর্ব্বস্ব', পুরাণসর্ব্বস্ব' ও 'পন্ডিতসর্ব্বস্ব' রচনা করেছিলেন।

শূলপানি ও এই সময় কার একজন বিখ্যাত পন্ডিত, ইনি 'দীপকলিকা' যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টিকা রচনা করেন।

নারায়ণ দত্ত লক্ষণ সেনের আদেশে 'ত্রিকান্ডশেষ' নামক এক অভিধান রচনা করেন।

উমাপতি ধর দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশর মন্দিরের প্রশস্তি রচনা করেন। তবে তার কোন লিখিত গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জয়দেব উমাপতি সম্মন্ধে মন্তব্য করেছেন— 'বাচঃ পল্লবয়ব্যুমাপতিধরঃ' লক্ষ্মণসেনের প্রথমভাগে সম্ভবত উমাপতিধরের মৃত্যু হয়।

শরণ দূরূহ কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গবেষকেরা মনে করেন 'সুক্তিকর্ণামৃত্তে'

তার পাঁচটি শ্লোক আছে। তবে কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

গোবর্দ্ধনাচার্য 'আর্য্যাসপ্তশতী' নামে শৃঙ্গাররস প্রধান একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সেন বংশের উল্লেখ আছে এই ভাবে—

"সকলজলাঃ কলয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেন-কুল-তিলক-ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ।।"

বল্লাল সেন এনাকে কৌলিন্য মর্যাদা প্রদান করেছিলেন, দাতা বলে গৌবর্দ্ধনের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল।

জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। 'গীতগোবিন্দ' শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ জয়দেবের বন্ধু পরাশর দ্বারা গীত হয়েছি। জয়দেবের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনিও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। বলা ভালো জয়দেবের যোগ্য সহধর্মীণী। জয়দেবের জন্ম স্থান বীরভূমের কোন্দুলী এখন বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র ও দর্শণীয় স্থান।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ধোয়ী, ধোয়ী কবিত্বশক্তির জন্য কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি 'পবনদূত' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

"মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' রচনা করিয়া যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া পরবর্তী কবিগন 'পবনদুত', 'উদ্ধবদূত', 'কোকিলদূত', 'হংসদূত', 'পদাঙ্কদূত', প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। ইহাঁরা কেহই কালিদাসের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না,— কাহারও কাব্য "মেঘদূতে'র ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই।"[১১]

এ মন্তব্য যথার্থ, এছাড়া তার রচিত 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' সংস্কৃত কাব্যে অন্যতম মাইস্টোন।

লক্ষ্মন সেন অত্যন্ত দাতা ছিলেন মুসলমান লেখকেরা 'তবকৎ-ই নাসিরি'-তে এরকমই দাবী করেন, লক্ষ্মণ সেন পিতৃপ্রদত্ত কুলবিধির উৎসাহ দাতা ছিলেন। অবশ্য তিনি নিজে প্রথম বয়সে শৈব এবং শেষ বয়সে পরম বৈষ্ণব হন। তিনি সাহিত্যচর্চারও উৎসাহ দাতা ছিলেন এবং এই জন্য সমস্ত ভারতে বিদ্যৎসাহী হিসাবে তার খ্যাতি আছে। পিতার অসমাপ্ত কাব্য 'অদ্ভুতসাগর'

তিনি নিজে সমাপ্ত করেন। এরপর ১২০৬খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খলজির অতর্কিত আক্রমনে গৌড় ও নবদ্বীপের রাজধানী থেকে বিতাড়িত হলে গৌড়মন্ডলে সেন অধিকার লুপ্ত হয়।

বিন্‌বক্তিয়ার খলজীর অতর্কিত আক্রমনে সেন সম্রাজ্যের পতন হলে বাংলা তথা গৌড় মন্ডল দিল্লী সম্রাটদের শাসনাধীনে চলে যায়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরুঢ় ছিলেন কুতবুদ্দিন আইবক। বাংলা ও বিহার জয়ের জন্য বক্তিয়ার খলজিকে নিয়োগ করেছিলেন কুতবদ্দিন আইবক। তাই কুতবদ্দিনকে প্রভু স্বীকারকরে বাংলা ও বিহারের শাসক হন তিনি এবং দিল্লীর সম্রাটের নামে খোত্‌বাপাঠ ও সিক্কার প্রচলন করেন।

সেনদের রাজধানী লক্ষ্মাবতীকে তিনি গৌড়মন্ডলের রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করে ১২০৬খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বত অভিযান করলে সে অভিযান সাফল্য মন্ডিত হয়নি। এই অভিযানে তাঁর অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিহত হন এবং বক্তিয়ার খলজি নিজেও প্রচন্ড আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে, তাঁর সামরিক ঘাঁটি দেবকোটে প্রত্যার্বতন করলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন— তাঁর বিশ্বস্ত আলীমর্দান কতৃক তিনি নিহত হন।

বিন্‌-বক্তিয়ার-খলজীর মৃত্যুর সময় থেকে কদর খানের শাসনকাল (১৩২৫-১৩৩৮)খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়মন্ডল দিল্লীর শাসকদের অধীনেই ছিল, কিন্তু ১৩৩৮খ্রীষ্টাব্দে কদর খানের মৃত্যুর পর স্থানীয় সুলতানরাই স্বাধীনভাবে শাসন কার্যপরিচালনা করতে থাকেন।

এতদীর্ঘ সময়ে দিল্লীর সম্রাটদের রাজপ্রতিনিধির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যারা পালন করেন তাদের নামও সময়কাল খুব সংক্ষেপে আমরা এখানে দেখে নিতে পারি।

বক্তিয়ারের মৃত্যুর পর তার স্থালাভিসিক্ত হন আজ্জউদ্দিন মুহাম্মদ শিরান (১২০৬-১২০৮), এরপর ক্রমান্বয়ে আলাউদ্দিন আলিমরদান খলজি (১২০৮-১২১১), গিয়াসউদ্দিন ইউয়াজ (১২১১-১২২৬), নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১১২৭-১২৩৩), ইজুদ্দিন তগরিল (১২৩৩-১২৪৪), কতলু খাঁ (১২৫৮-১২৫৯), জালালউদ্দিন আরসলান খাঁ(১২৫৯-১২৬০), তাতার খাঁ (১২৬০-১২৭৭), শের খা (১২৭৭-১২৭৮), আমিন খাঁ (১২৭৮-১২৭৯) মুগিস্‌উদ্দিন তুগ্রিল (১২৭৯-১২৮২), বোঘরা খাঁ (১২৮২-১২৯২), রুকুনুদ্দীন ফিরোজ শা (১২৯২-১৩০১), শামসুদ্দীন ফিরোজ শা(১৩০১-১৩২২), এরপর নাসিরুদ্দিনের চারজন পৌত্র যথাক্রমে ১৩০৭ থেকে ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধির দ্বায়িত্ব পালন করেন। এরা হলেন— জালাল্লুদীন মামুদ,

শিহাবুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন, নাসিরুদ্দীন। এদের মধ্যে নাসিরুদ্দীন বাদে সকলেই কার্যত স্বাধীন ছিলেন। কেননা তাদের স্বনামে মুদ্রার প্রচল ছিল।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শা স্বীয় পুত্র জালালুদীন ও গিয়াসুদ্দীনকে তাঁর জীবিত কালেই মুদ্রা প্রচলনের অনুমতি দান করেছিলেন বলে মনে হয় এবং তারা পিতাপুত্র ছিলেন বাংলার যুগ্ম শাসক।

মুহাম্মদ বীন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে বসারপর বিভিন্ন সময়ে তিনি বেশ কয়েকজন শাসন কর্তা নিয়োগ করেন। এর মধ্যে কদর খান (১৩২৫-১৩৩৮) হচ্ছেন একজন। বীনতুঘলকের রাজধানী পরিবর্তন সহ নানারকম ইটকারি সিদ্ধান্ত এবং পর পর কয়েক বছর দুর্ভিক্ষর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বৃহত্তর সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে পড়ে। ফল স্বরূপ দূরবর্তী প্রদেশ গুলোকে নিয়ন্ত্রন করা অসম্ভব হয় পড়ে এবং এই সুযোগে ফকরুদ্দীন মোবারক শা ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সোনার গাঁ-ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই মোজাফফর আলীশাহ কদর খানকে হত্যা করে নিজেকে লক্ষ্মাবতীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এর কিছুদিনের মধ্যে ইলিয়াস শাহ আলামোবারক কে হত্যাকরে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের শাসন কতৃত্ব দখল করে। অন্যদিকে সুলতান ফকুরুদ্দীন ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর তার মৃত্যু হলে পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ সিংহাসনে বসেন এবং ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইলিয়াস শাহ দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্রবঙ্গের অধিপতি হন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম হল শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-১৩৫৮)। তিনি সমগ্র বাংলাদেরশের উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য বিস্তারে তিনি পশ্চিমদিকে বেনারসী পর্যন্ত অধিকার করেন। পূর্ববঙ্গে অবস্থান কালে পার্বত্য ত্রিপুরা ছাড়া সমস্তই তিনি তার সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করেন। ১৩৫৩ নাগাদ তিনি নওয়াখালি অঞ্চল সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করেন। ১৩৫৩ নাগাদ তিনি নওয়াখালি অঞ্চল দখল করেন। ত্রিহুত সাম্রাজ্যকে ও সাম্রাজ্যভুক্ত করলে দিল্লির সম্রাট ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। ফলে ইলিয়াস শাহ পান্ডুয়া রাজধানী

ত্যাগ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দুপক্ষের ভীষণ যুদ্ধের পর দুপক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয় এবং ইলিয়াস শাহের পুত্র বন্দী হলে উভয় পক্ষের সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটে। চুক্তি অনুযায়ী ইলিয়াস শাহ সম্রাটকে কর দিতে রাজি হন এবং সম্রাট তার পুত্রকে মুক্তি দেন। এরপর ১৩৫৭খ্রীষ্টাব্দ 'ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হলে তার পুত্র সেকেন্দর শাহ পিতৃপদ অধীকার করেন।

কথিত হয় যে, শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহ ছিলেন আলি মুবারকের ধাত্রীপুত্র। কোন এক দোষের কারণে তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেন এবং স্বীয় বুদ্ধি বলে এক সময় বাংলারস্বাধীন সুলতান পর্যন্ত হন। এবং এই সময়ে নানাদিক দিয়ে দেশের উন্নতি হতে শুরু করে।

সেকেন্দর শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সেকেন্দর শাহ ১৩৫৮-১৩৯০পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। সিংহাসনে বসার মাত্র এক বছরের মধ্যে সম্রাট ফিরোজ শাহ পুনরায় বাংলা আক্রমন করলে সেকেন্দর শাহ ৪০টি হাতি এবং অন্যান্য দামী উপহার দ্রব্য পাঠিয়ে সন্তুষ্ট করলে তিনি দিল্লিতে ফিরে যান। এরপর সুদীর্ঘকাল তিনি রাজত্ব করেন এবং কোন বহিঃ শত্রুর আক্রমন বাংলাতে হয়নি। ইনিই বিখ্যাত আদিনামসজিদ তৈরী করান। পন্ডিত রজনী কান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা মনে করেন—

"সিকন্দর একটি প্রকান্ড বৌদ্ধস্তুপ ধ্বংস করিয়া আদিনা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন।"[১২]

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

সেকেন্দর শাহের রাজত্বকালে তার পুত্র বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে পান্ডুয়া সংলগ্ন গোয়াল পাড়া নামক স্থানে দুপক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হলে বিরোধী পক্ষের একটি বর্শা সিকন্দরের হৃদয় বিদ্ধ করলে ১৩৯২খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে পুত্র গিয়াসুদ্দীন উক্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি ন্যায় বিচারক ছিলেন এবং ন্যায় বিচারককে সম্মান করতেন। এ বিষয়ে অনেক গল্প কাহিনি শোনা যায়।

গিয়াসুদ্দীন বর্ধমান থেকে সিলেট পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করান। এই সময়ে বাংলার

সীমা দক্ষিণ উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে রাজা গণেশ প্রভাব বিস্তর করেছিল। গণেশ বীরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভাতুরিয়া পরগনার চতুঃসীমা উত্তরে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে রাজশাহীর কিছু অংশ পশ্চিমে মহানন্দা ও পুর্নভবা এবং পূর্বে করতোয়া এই বিশাল ভূভাগের জমিদার ছিলেন রাজা গণেশ।

আবুল মুজাহিদ হাম্‌জা শাহ

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র সৈফুদ্দীন হামজা শাহ খুব অল্প সময়ের জন্য (১৪১১-১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় তিনি তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও ফিরোজাবাদ অর্থাৎ পান্ডুয়া থেকে তিনি মুদ্রার প্রচলন করেন।

সৈফুদ্দীনের পর শামসুদ্দীন বায়াজিদ শাহ সিংহাসনে বসেন (১৪১২-১৪১৪) এবং অল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে উপরের তিনজন সুলতানদের সম্পর্কে আবিদ আলি খানের একটি মন্তব্য স্মরণ যোগ্য—

"সম্ভবত শেষোক্ত তিনজন সুলতান রাজা কংশের হস্তের ক্রীড়ানক মাত্র ছিলেন। গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজা কংশ ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হন।"[১৩]

রাজা গণেশ

উপরিউক্ত তিনজন সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে ভাতুরিয়া পর্গনার জমিদার তার কর্মদক্ষতায় গিয়াসুদ্দীনের আমলেই রাজসভার একজন প্রধান আমীর হয়েছিলেন। ক্রমে তিনি শাসন ও রাজস্ব বিভাগের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।

রাজাগণেশ কে 'রিয়াজু সালাতিনকার' কংস নামে অভিহিত করেছেন। তাকে নিয়ে প্রাচীন ইতিহাসিকদের মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন তিনি মুসলমানদের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন আবার কেউ বলেন তিনি মুসলমান বিরোধী ছিলেন। আমাদের কিন্তু তেমন মনে হয়না। আমাদের মনে হয়—

হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও হজরত নূর-কুতবুল আলাম নামে এক পীর বা মুসলিম ধর্মপ্রচারকের

জ্ঞানও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান ধর্মের প্রতি অনুরুক্ত হয়ে পড়েন এবং মুসলমান ধর্ম্মালম্বন করতে চাইলে স্ত্রীর বিরোধীতায় সম্ভব না হলে পর, স্বীয়পুত্রকে উক্ত ব্যক্তির দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করান। কংশের এই পুত্রের নাম- যদু। ইসলাম ধর্মগ্রহনের পর যদু জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং পিতৃ সিংহাসনে বসেন। রাজা কংশ বা গণেশ পরবর্তীকালে দনুজ মর্দ্দন উপাধি ধারণ করেন। স্থানাভাবে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা গেলনা, পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য বিষয়টি আমাদের কাছে নির্দিষ্ট রইল।

জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ

রাজা কংসের মৃত্যুর পর স্বভাবতই তার পুত্র যদু সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসেই ইসলাম ধর্ম বিস্তারের মন দিলেন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার ও চাপ সৃষ্টি করেন। যা-ই হোক জালালুদ্দীনের সময় গৌড় পান্ডুয়ার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তার আমলে পান্ডুয়াতে একাধিক অট্টালিকা এবং গৌড়ে একাধিক পুকুর নির্মিত হয়। গৌড়ের বিখ্যাত সরাই তাঁর আমলেই নির্মিত।

জালাউদ্দীন গৌড়েও বাস করতেন। ঐ এলাকায় তার জন্য একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও নির্মাণ করান তিনি। জালালুদ্দীনের নামাঙ্কিত একাধিক মুদ্রা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি প্রায় পনের বছর রাজত্ব পরিচালনা করেন (১৪১৫-১৪৩১)খ্রীষ্টাব্দ। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুইজন ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পান্ডুয়ার 'একলক্ষী সমাধি ভবনে' তাকে সমাহিত করা হয়।

জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৪৩১ থেকে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুজাউদ্দীনের কাল পর্যন্ত প্রায় ২৬ জন সুলতান বাংলার তথা গৌড় পান্ডুয়ার মসনদে বসেন। তাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনের খ্যাতি বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্বের আলোচনায় সংক্ষেপে তাদের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখে নেব আমরা।

আহমদ শাহ থেকে - সুজাউদ্দীন (১৪৩১-১৭২৫)

জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি

১৪৩১-১৪৪২খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। অবশেষে তিনি তাঁর দরবারের অমাত্য শাদি খান ও নাসির খান তাঁকে হত্যা করেন এবং নাসিরুদ্দীন মামুদই পরবর্তী সুলতান হন। তাঁর আমলে গৌড় পান্ডুয়ার অনেক অট্টালিকা নির্মিত হয় এবং এই সময় পাথরের উপর একপ্রকার তোগরা শিলালিপি খোদাই করার শিল্প অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে। নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের রাজত্যকাল ১৪২২-১৪৫০খ্রীষ্টাব্দ।

নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র রুকুন্নদ্দীন বারবক শাহ সিংহাসনে বসেন। তার শাসন আমলে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে সেনাবাহিনী স্বাচ্ছন্দে বসবাস করেন। তিনি ১৪৫০থেকে ১৪৭৪খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুলতান ছিলেন। বারবকের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহ উক্ত সিংহাসনে বসেন এবং ১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাঁর মধ্যে অনেকগুলি সৎগুনের সমাহার থাকায় প্রজারা এনাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন।

ইউসুফ শাহের পুত্র সেকেন্দার চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফতে শাহ পরবর্তী সুলতান হন। ইনি বিদ্যান ও জ্ঞানী বলে সুপরিচিত ছিলেন। অল্প কিছুকাল রাজত্ব করার পর সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। ফিরোজ শাহের ন্যায়নিষ্ঠ ও কল্যাণকর শাসনব্যবস্থারজন্য জনগন রাষ্ট্রের মধ্যে যথেষ্ট সুখে কালাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর দানশীলতার খ্যাতি ছিল। তিনি ১৪৮৬ থেকে ১৪৮৯খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মাহমুদ শাহ পিতৃ সিংহাসন লাভ করে। মাত্র একবছরের শাসন কালে (১৪৮৯-১৪৯০) তিনি তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেন নি। শামসুদ্দীন মোজাফফর শাহ নামক একজন হাবশি তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

মোজাফফর শাহ অত্যন্ত নির্মম এবং অত্যাচারী শাসক বলে কুখ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট মন্ত্রী এবং আমিররা মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে হত্যা করে। তিনি ১৪৯০-১৪৯৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হোসেন শাহ বাংলার সুলতান হন।

১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ এই সুদীর্ঘ কালের শাসন ব্যবস্থায় বাংলার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। সমৃদ্ধির দিক দিয়েও বাংলার বাইরে খ্যতি ছড়িয়ে পড়ে। গৌড় পান্ডুয়ার সাধারণ উৎসবেও স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল। স্থাপত্য কলায় ও যথেষ্ট উন্নতির বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়।

সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তার রাজত্বকালিন সময়। তার বিখ্যাত দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতন। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের শিষত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্মগুরু হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। দুজনেই সংস্কৃত ও ফার্সীতে দক্ষ পন্ডিত ছিলেন। দুই ভাই প্রায় পঞ্চাশ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

হোসেন শাহ গৌড় দুর্গের সংস্কার করান এবং বহু অট্টালিকা নির্মান করান। তাছাড়া তিনি তাঁর সময়ে সম্পূর্ণ কামতা পুর রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন। উড়িষ্যা আক্রমন ও বিহার জয়ের চেষ্টা করেন। সেকেন্দার লোদীর সাথে সন্ধি হলে পুনরায় বাংলাতে ফিরে আসেন। সুশাসক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। হোসেন শাহের সময়ই বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান পুরধা শ্রী চৈতন্যদেবের আগমন ঘটে গৌড়ের নিকটেই রামকেলি নামক ব্রাহ্মণ অধ্যুষ্যিত গ্রামে। এই উপলক্ষে রামকেলিতে আজও মেলা বসে। রামকেলিকে গুপ্ত বৃন্দাবন ও বলা হয়।

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন (১৫১৯-১৫৩২)। পিতার মত তাঁর তেমন কোন রাষ্ট্র পরিচালনার গৌরব না থাকলেও বিশেষ কয়েকটি কারণের জন্য তার শাসনকাল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন এই সময় দিল্লির সম্রাট বাবর সুলতান সেকেন্দার লোদীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। ফলে অনেক শাহজাদা দিল্লি ছেড়ে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। নসরত শাহ তাঁদের মর্যাদানুযায়ী জীবন যাপনের সুবিধা প্রদান করেন। গৌড়ের কদম রসুল ভবন এবং বড় সোনা মসজিদ তাঁর আমলে নির্মিত হয়।

নসরত শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসন অধিকার করলে অল্পদিনের মধ্যেই খুল্লতাতের দ্বারা নিহত হন। মামুদ শাহ খুব বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যাকরে। মাত্র ছয় বছরের রাজত্ব কালেই (১৫৩২-১৫৩৮) শের শাহ কতৃক সিংহাসন চ্যুত হলে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় মামুদ শাহের মৃত্যু হলে হুমায়ুণ বাংলার সাথে সাথে দিল্লির অধীশ্বর হন।

দিল্লির অধীশ্বর হলে তিনি বাংলার সোনার গাঁ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত তিনি একটি বৃহৎ রাস্তা নির্মাণ করান। রাস্তার দুই পার্শ্বেই ছায়া গাছ লাগানো হয় এবং প্রয়োজনীয় স্থানে সরাইখানা ও কূপ খনন করান। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যু হয়।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লির সম্রাট হয়ে মুহাম্মদ খান শূরকে বাংলার শাসন কর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু হঠাৎ ইসলাম শাহের মৃত্যু হলে তার পুত্রকে হত্যা করে মুহাম্মদ খান বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তিনি ১৫৫৪-১৫৬০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাহাদুর শাহ আদিল শাহকে হত্যা করে পিতৃপ্রতিশোধ গ্রহন করেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তার ভাই জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ— (১৫৬০-১৫৬৩) গৌড় নগরে রাজত্ব করেন।

জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর সোলেমান খান কররাণী (১৫৬৪-১৫৭২) এবং তৎপুত্র বায়াজিদ অল্প কিছু কালের জন্য রাজত্ব করেন। পাঠানদের হাতে তাঁর মৃত্যু হলে দাউদ খানকে স্থালাভিসিক্ত করানো হয়। দিল্লির আনুগত্য অস্বীকার করলে দিল্লি থেকে মুনিম খানকে প্রেরন করলে তিনি গৌড় জয় করেন কিছু কালের জন্য। সুযোগ বুঝে দাউদ পুনরায় গৌড় আক্রমন করলে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এই সময় দিল্লির সম্রাট আকবর।

এরপর ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে খান-ই আজম, ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহবাজ খান এবং ১৫৮৯খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ দিল্লির রাজ প্রতিনিধি রূপে বাংলার শাসন ভার গ্রহন করেন। এরপর কুতবুদ্দীন খান ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে, জাহাঙ্গীর কুলি খান ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ও ইসলাম খান ১৬০৭-১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন কার্য পরিচালন করেছিলে দিল্লির রাজ প্রতিনিধি রূপে।

পরবর্তীকালে কাসিমখান ১৬১৩-১৬১৮ ও ইব্রাহিম খান ১৬১৮-১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। এই সময় দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীর। ইসলাম খানের ভাই কাসিম খান এবং সম্রাজী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম। এই সময় ঢাকার মসলিন, মালদার আগ্রা ও দিল্লির রাজদরবারে যথেষ্ট কদর ছিল। উল্লেখ্য এই সময়ই ইংরেজরা পাটনায় সর্বপ্রথম ব্যবসার জন্য কুঠি তৈরি করে আস্থানা গাঢ়তে শুরু করে।

শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা ১৬৩৯খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করে বাংলাতে আসেন। তার আগে প্রায় সাতজন শাসন কর্তা পরপর বাংলায় দ্বায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিল দিল্লির সম্রাটদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত। শাহজাদা সুজা প্রথমে ঢাকার রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয় এবং পরে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজমহল এখন গঙ্গাগর্ভে বিলিন এবং কিছু অংশ ঝাড়খন্ড রাজ্যে অবস্থিত আছে।

এই সময় একজন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট শাজহানের এক কন্যাকে চিকিৎসায় সুস্থ্য করে তুললে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসার অনুমতি পায়। সেই অনুমতি পত্র নিয়ে শাহজাদা সুজার কাছে আসলে সমস্ত ঘটনা জানার পর তাঁর নিজের অন্তপুরের এক মহিলাকেও চিকিৎসা করান এবং সুস্থ হন। ফল হিসাবে বিনাশুল্কে ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হুগলি ও বালেশ্বরে ইংরেজরা কারখানা ও কুঠি নির্মাণের অনুমতি পায়। ওই ইংরেজ ডাক্তারের নাম ডা. ব্রোউটন।

এরপর শাহজাদা সুজার সাথে ওরঙ্গজেবের যুদ্ধ হলে পরাজিত হয়ে টান্ডায় আত্মগোপন করার পর সেনাপতি মীরজুলমা কতৃক বিতাড়িত হয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করার পর রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করা হয়। শাহজাদা সুজা- বাংলায় দুইবার শাসনকর্তা নিয়োজিত হন ১৬৩৯-১৬৪৯ এবং ১৬৪১-১৬৫৯খ্রীষ্টাব্দ।

এরপর মীরজুলমা ঔরঙ্গজেবে কতৃক বাংলার সুবাদার নিয়োজিত হন। তিনি রাজধানী এবার রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা কুচবিহার রাজ্য ও আসাম জয় করেন যথাক্রমে ১৬৬১ ও ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের খিজিরপুরে মৃত্যু হয়।

মীর জুলমার মৃত্যুর পর উক্তপদে অধিরূঢ় হন শায়েস্তা খান। তিনি ১৬৬৩-১৬৮৯খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। শায়েস্তা খাঁন ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাইপো। জনশ্রুতি আছে, তাঁর শাসনকালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য খুবই কম ছিল, টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত।

শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর পনের বছরে ছয়জন শাসনকর্তা বাংলায় নিয়োগ হন। প্রত্যেকেই খুব অল্প কালের জন্য দ্বায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদ কুলি খান বাংলার শাসন কার্য পরিচালনার অধিকারী হন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলা তাঁর নামানুসারেই প্রচলিত। তাঁর আমলে এই শহরের অনেক উন্নতি লাভ হয়। এরপর ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে সুজাউদ্দীন বাংলার শাসনে বসেন

সুজাউদ্দীনের সময় থেকেই বাংলা পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করে স্বাধীন নবাব হিসাবে দেশ শাসন করতে থাকে। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সরফরার খান ১৭৩৩-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করার পর ১৭৪০খ্রীষ্টাব্দে আলাবর্দি খান প্রায় ষোল এ বছর রাজত্ব করেন। প্রিয় দৌহিদ্র সিরাজদৌলাকে ১৭৫৬ সালে নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে

নির্বাচিত করে যান।

সিরাজদৌলা সিংহাসনে বসার পর পারিবারিক কোন্দলে দূর্বলতার সুযোগে ইংরেজদের সাথে মতানৈক্য ঘটলে এবং রাজকর্মচারীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় ১৭৫৭খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ফলে বাংলার স্বাধীনতা তখন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। এরপর যারা বাংলার ঐ মসনদে বসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইংরেজদের ক্রীড়ানক মাত্র।

নবাব সিরাজের আমলে বাংলার শাসনাধীন ছিল অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে গৌড়বঙ্গের আকৃতি কখনো ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করেছে আবার কখনও বৃহদাকৃতি ধারণ করেছে সমগ্র আলোচনায় আমরা সেই বিষয়টি দেখলাম। কিন্তু বর্তমানে গৌড়বঙ্গ বলতে পশ্চিম বাংলার দুই দিনাজপুর এবং মালদাকে কেন্দ্র করে তার সীমা কেন্দ্রায়িত হয়েছে ২০০৮ সালে 'গৌড়বঙ্গ' বিশ্ববিদ্যাল নামক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর এই ক্ষুদ্র আকৃতির গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা, খন, আলকাপ এবং ডোমনি নিয়ে আমাদের বিশেষ গবেষণা।

প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী পর্যায়গুলো আলোচনার আগে এ পর্বেই আমরা লোকসংস্কৃতির ধারণা সংক্ষেপে দেখে নেবার চেষ্টা করি।

লোকসংস্কৃতি অভিজ্ঞান

লোকসংস্কৃতি-র তাৎপর্য নিয়ে বাংলার বিদ্যৎ সমাজে আলোচনা-সমালোচনার অন্ত নেই। মূলত ইংরেজি Folklore এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকসংস্কৃতি' কথাটিকে ব্যবহারের প্রবণতা অধিকমাত্রায় লক্ষিত হচ্ছে। অনেকে আবার 'লোকসংস্কৃতির'-র পরিবর্তে 'লোকলোর' কিংম্বা সরাসরি ইংরেজির মূল শব্দ 'ফোকলোর' ব্যবহারের পক্ষপাতি। বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ে নানান আলোচনায় পবিত্র সরকার, সৌমেন সেন, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত বিশ্বাস, বরুণ চক্রবর্তী, শেখ মকবুল ইসলাম, মযহারুল ইসলামের মত পন্ডিত ব্যক্তিরাও তাঁদের একাধিক মত প্রকাশ করেছেন এবিষয়ে। পরে আমরা তা উল্লেখ করব কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আপাতত বহু প্রচলিত 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিই ব্যবহার করব।

বাংলাদেশে প্রাথমিক লোকসংস্কৃতি চর্চার শুরু হয় মূলত একজন ইংরেজের হাত ধরে। তিনি হলেন উইলিয়ম কেরি। তাঁর গ্রন্থের নাম 'ইতিহাস মালা' ড. বরুণ চক্রবর্তী তাঁর 'বাঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এ সম্পর্কে বলেছেন "আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস... উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাস মালা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে।" [১৪] গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায়। (অপর্ণাবুকস, কোলকাতা।)
তারপর বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে অনেকেই বাংলা লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন। তবে তার বেশিরভাগই ছিল সংগ্রহ মূলক। যেমন দক্ষিণা রঞ্জন মিত্রের ঠাকুদাদার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝুলি, রবীন্দ্র নাথের ছেলে ভুলানো ছড়া, কবি সঙ্গীত ইত্যাদি এগুলিই সবই ছিল সংগ্রহমূলক। বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিক পঠন-পাঠন ও গবেষণার সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ সূচনা থেকে। বিশেষত—"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এম.এ.পাঠক্রমে 'লোকসাহিত্য' অন্যতম বিশেষ পত্ররূপে সংযোজিত হয়।"[১৫] মূলত আশুতোষ ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও উদ্দ্যেগে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে ও প্রায় সমসাময়িক কালে 'বাংলা একাডেমি' গঠনের মাধ্যমে একই চর্চা শুরু হয়।

পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য অনেক আগে থেকেই লোকসংস্কৃতি চর্চার শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য

লোকসংস্কৃতি বলতে Folklore বোঝায়। জানা যায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে "William John Thoms, সর্বপ্রথম The Athenacum পত্রিকায় ২২শে আগস্ট সংখ্যায় Folklore পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন।" [১৬] Folklore শব্দটিকে লোকসংস্কৃতিবিদেরা 'Saxon Compound Word' বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৭]

এরপর ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে Thomas Sternberg তাঁর শিরনামে সর্বপ্রথম Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম হল 'The Dialect and Folk-lore of Northamptonshire'। গ্রন্থটির প্রকাশ ইংল্যান্ডের 'Oundle and Barkley'.

যাই হোক তখন থেকেই পাশ্চাত্যদেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত এবং ক্রমন্বয়ে তার অগ্রগতি। এদিকে বাংলায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ দিতে থাকেন বিশ্ববিখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ 'Anthropological Survey of India'-র সহকারী অধ্যক্ষ পন্ডিত ড. ভেরিয়ার এলউইন মহাশয়। তখন থেকেই বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি Folklore এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করি। ইংরেজি এবং বাংলা দুটি শব্দকেই আমরা একটু দেখে নেব। সাধারণত ইংরেজি Folk শব্দটি বাংলায় 'লোক' বলে বিবেচিত করা হয়, আর Lore শব্দটি 'সংস্কৃতি' ধরে নিয়ে বলা হয় একসঙ্গে 'লোকসংস্কৃতি'। তবুও লোকসংস্কৃতির অভিজ্ঞ পন্ডিতেরা এই শব্দটিকে সর্বজন গ্রাহ্য করে নিতে পারেন নি। তাই নানান জনে নানান রকম মত প্রকাশ করেছেন এবং নিজের পছন্দসহ' প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। Folklore এর প্রতিশব্দ হিসাবে কে কোন শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন তা লক্ষ্য করা যাক—

	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	—	ব্যবহৃত পরিভাষা
১।	ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	—	লোকযান
২।	ড. মহম্মদ শাহীদুল্লাহ	—	লোকবিজ্ঞান
৩।	মহম্মদ মনুসুরদ্দীন	—	ঐ
৪।	ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য	—	লোকশ্রুতি
৫।	রমা প্রসাদ চন্দ	—	লোকবিদ্যা

৬।	ড. বাসুদেব শরণ আগরওয়ালা	—	লোকবার্তা
৭।	ড. সুকুমার সেন	—	লোকচর্যা
৮।	রামণরেশ ত্রিপাঠী	—	গ্রাম সাহিত্য
৯।	ড. কৃষ্ণদেব উপধ্যায়	—	লোকসংস্কৃতি
১০।	ড . বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া	—	ঐ
১১।	ড. কেশরী নারায়ণ	—	লোকবাঙ্গময়
১২।	ড. ত্রিলোচন পান্ডে	—	ঐ
১৩।	ড. প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী	—	জনসাহিত্য
১৪।	ড. মাযাহারুল ইসলাম	—	লোকলোর/ফোকলোর
১৫।	আব্দুল হাফিজ	—	লোকতত্ত্ব
১৬।	ড . আনোযারুল করীম	—	লোকঐতিহ্য
১৭।	অরুণ রায়	—	লোকায়ণ
১৮।	শঙ্কর সেনগুপ্ত	—	লোকচারণা
১৯।	ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক	—	লোকচারণা
২০।	ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়	—	লোককৃতি
২১।	ড. পবিত্র সরকার	—	লোকরিক্থ্

—৫

এছাড়া পল্লব সেনগুপ্ত, বরুণ চক্রবর্তী, মকবুল ইসলাম, প্রদ্যোত ঘোষ, শক্তিনাথ ঝা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রধান পুরধারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই "লোকসংস্কৃতি' শব্দটিকে মান্যতা দান করেছেন এবং শব্দটির ব্যবহার বাড়িয়ে তুলেছেন।

তবে এক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত মত Folklore -এর 'কৌম' lore এবং অর্থে বহুব্যবহৃত 'সংস্কৃতি'

কারণ 'লোকসংস্কৃতি' বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল নির্দিষ্ট কোন 'কৌম' বা 'গোষ্ঠী'র প্রচলিত সংস্কৃতি। এই কোম বা গোষ্ঠীর পরিবেশিত বা পালনীয় কোন ঐতিহ্যবাহি প্রথা যখন দুঃখ কিম্বা আনন্দে বিনোদন সহ অন্যকোন রকম মাধ্যম হয়ে ওঠে তখন তাকে আমরা 'লোকসংস্কৃতি' বলি। প্রকৃত অর্থে 'লোক' বলতে পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তিকে বোঝায়। আর পৃথিবীর কোন

লোকসংস্কৃতিই অখিল ভূবনের সংস্কৃতি এখনও হয়ে উঠতে পারেনি, আর কোনদিন পারবেও না বোধ হয়। কিন্তু প্রতিটি লোকসংস্কৃতি-ই আসলে নির্দিষ্ট কোন না কোন গোষ্ঠি বা সমাজের পালনীয় সংস্কৃতি। আর এই লোক সংস্কৃতি পালনের সময় কেবলমাত্র ঐ এলাকার এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলের অনান্য গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কিছু লোকও প্রভাবিত হয়ে অংশ গ্রহণ করার ফলে তার পরিসর কিছুটা বেড়ে গেলেও বিশ্বজনীনতা ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় মানেই 'কৌম'। আর তাদের প্রচলিত সংস্কৃতিই 'কৌমসংস্কৃতি' বললে বেশি যুক্তি গ্রাহ্য নয় কি?

আমাদের গবেষণায় আলোচ্য গম্ভীরা, খন, আলকাপ, ডোমনি ও নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী, সমাজও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব-বিস্তার করেছে। তাই এর প্রতিটিই আমাদের কাছে কৌম সংস্কৃতি বলে বিবেচিত হয়। এছাড়াও আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি লোকনাট্য অর্থাৎ কৌমনাট্যের অন্তরভুক্ত। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে আমরা তাদের বিস্তারিত আলোচনা করে বুঝে নেব।

গৌড়বঙ্গের ইতিহাস

তথ্যসূত্র ঃ

১) ড. সেন দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, পৃ— ১১৬, সাহিত্যলোক, কোল

২) ঐ, বৃহৎ বঙ্গ, পৃ- ২৪৯, দেজ, কোল

৩) ঐ, পৃ- ২৫৩,

৪) চট্টোপাধ্যায় রূপশ্রী, গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল, পৃ-৩৯, ফার্মা কে এল এম, কোল

৫) ড. সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, পৃ- ২৭২, দেজ, কোল

৬) চক্রবর্তী রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, পৃ- ১৫০, দেজ, কোল

৭) চট্টোপাধ্যায়, রূপশ্রী, প্রাগুক্ত- পৃ-৪২

৮) চক্রবর্তী রজনীকান্ত, প্রাগুক্ত- পৃ- ১০৩

৯) ঐ, পৃ-৯২-৯৩

১০) পাগল বিচরণ, শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা, পৃ- ৫, মতুয়া মহাসংঘ, ঠাকুর নগর, বাংলাদেশ।

১১) চক্রবর্তী রজনীকান্ত, গ্রাগুক্ত- পৃ-১২৩

১২) ঐ, পৃ- ২০২

১৩) খান আবিদ আলী, গৌড় পান্ডুয়ার স্মৃতি, পৃ-৩৭, সোপান, কোল

১৪) ড. চক্রবর্তী বরুণ, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ভূমিকা, অপর্ণাবুক, কোল

১৫) শেখ ইসলাম মকবুল, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান ঃ শিকড়ের সন্ধানে, পৃ- ৪০৫, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোল

১৬) ঐ, লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান, তত্ত্ব পদ্ধতি ও প্রয়োগ, পৃ-৪২, প্রাগুক্ত

১৭) ঐ, পৃ- ৪৮